ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 2, June, 2024

‘জেগে আছি’: আলাউদ্দিন আল আজাদের সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

Md. Abdus Sobhan Talukder
Associate Professor, Department of Bangla
University of Dhaka, Bangladwesh
Corresponding Author Email: upaltalukder501@gmail.com

ARTICLEINFO

Received : 14, April
Revised : 01, June
Accepted: 04, June

©2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

সার-সংক্ষেপ

বাংলাসাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রকাশ দুর্নিরীক্ষ নয়। সমাজ কাঠামো যেহেতু বৈষম্যভিত্তিক, তাই সেই কাঠামোর অন্তর্গত সম্পর্কগুলোও হয় অবশ্যম্ভাবীভাবে বৈষম্যভিত্তিক। কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন চিন্তা যা সাহিত্য ক্ষেত্রকেও প্রভবিত করেছে। এই দর্শনের মাধ্যমে শ্রেণি শোষণের স্বরূপ ও প্রক্রিয়া অনুধাবন করা যায় । সামন্ততন্ত্র, জমিদারতন্ত্র ও বর্তমানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ কার্যত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত– শোষক ও শোষিত। কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন চিন্তার মূল সারবত্তা হলো শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, যা শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। আলাউদ্দিন আল আজাদের *জেগে আছি* গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণি কীভাবে সাধারণ শ্রমজীবীদের ব্যবহার করে নিজেদের পুঁজি ও সম্পদ বৃদ্ধি করে। শ্রমজীবীরা শুধুই সম্পদ অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। শোষকশ্রেণি শ্রমজীবীদেরকে অধীন ও পঙ্গু করে রাখার জন্য শ্রমজীবীদের মধ্য থেকেই আরেকটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি সৃষ্টি করে। মধ্যস্বত্বভোগীরা শোষিত শ্রেণির শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। কিন্তু সচেতন জনগণ সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। প্রতিটি গল্পেই শোষক, শোষিত ও স্বার্থান্বেষী শ্রেণির উপস্থিতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সংগ্রাম ও দিন বদলের অঙ্গীকার।

ভূমিকা : আলাউদ্দিন আল আজাদ (জন্ম: মে ৬, ১৯৩২; মৃত্যু: জুলাই ৩, ২০০৯) পঞ্চাশ দশকের প্রথম কথাশিল্পী। তিনি বিভাগোত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যকে পরিণতি দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষত তাঁর ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রকাশ, মৃত্তিকা সংলগ্নতা, ভাষার সাবলীলতা, কাব্যময়তা ও বাক্য বিন্যাসের চমৎকারিত্ব তাঁকে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। বিদ্যালয়ে যখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন স্বপন বুড়োকে লেখা পত্রাংশ 'নিমন্ত্রণ' নামে যুগান্তর পত্রিকায় ছোটদের লেখার বিভাগে প্রকাশিত হয়। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আকালের পর কীভাবে নবান্ন উৎসব পালন করত তা প্রত্যক্ষ করার জন্য এ পত্রে স্বপন বুড়োকে দাওয়াত করেছিলেন তিনি। এখান থেকেই সাহিত্যিক আজাদের যাত্রা শুরু হয়। তিনি যখন নবম শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর প্রথম তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ 'আবেগ' মাসিক *সওগাত* পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর পর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় প্রথম ছোটগল্প 'জানোয়ার'। 'নিমন্ত্রণ' থেকেই তার সমাজসচেতন, জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটগল্প 'জানোয়ার'– অভাবের তাড়নায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটে পুত্রের মৃত্যু ও পরিণতিতে পিতার অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। অর্থাৎ সাহিত্যিক জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি সমাজ ও শ্রেণি সচেতন । তারঁ সাহিত্যিক মানস গঠনে অনেকাংশে সক্রিয় ছিল কৈশোরে পাঠ করা ম্যক্সিম গোর্কির ছোটগল্প।

আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৪৭ সালে নারায়ণপুর শরাফতউল্লাহ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৪৯ সালে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে বিএ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৪ সালে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তাঁর রচিত মৌলিক ছোটগল্প গ্রন্থ আটটি।

১. *জেগে আছি* (১৯৫০)
২. *ধানকন্যা* (১৯৫১)
৩. *মৃগনাভি* (১৯৫৩)
৪. *অন্ধকার সিঁড়ি* (১৯৫৮)
৫. *উজান তরঙ্গে* (১৯৬২)
৬. *যখন সৈকত* (১৯৬৭)
৭. *আমার রক্ত স্বপ্ন আমার* (১৯৭৫)
৮. *জীবন জমিন* (১৯৮৮)

এছাড়াও সংকলিত গল্পগ্রন্থ রয়েছে একাধিক:

১. *নির্বাচিত গল্প* (১৯৮৫)
২. *মনোনীত গল্প* (১৯৮৭)
৩. *শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প* (১৯৯৯)

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে শ্রেণিচেতনা: আলাউদ্দিন আল আজাদের জীবনস্মৃতিতে দেখা যায় যে, তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি থেকেই মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন । আলাউদ্দিন আল আজাদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুলতান উজ জামান 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামক বামপন্থী প্রতিষ্ঠানের বৈঠকে মাঝে মাঝে যেতেন। বামপন্থী রাজনীতির সক্রিয় কর্মী সাদেক খান ও তাঁর ছোটভাই কবি ওবায়দুল্লাহ খানের সঙ্গে আজাদের হৃদ্যতা ছিল। আজাদের মার্কসবাদী ভাবধারার কারণে কলেজের উগ্র ইসলামপন্থী ছাত্র সংগঠন কর্তৃক নির্যাতিত হন। ১৯৪৯ সালে দেশবন্ধু পার্কে নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্দার জাফরীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

মার্কসবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও সক্রিয় থাকার কারণে তাঁর সাহিত্য কর্মে এই আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পে শ্রেণিচেতনা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে সাহিত্যে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। সাহিত্য সম্পর্কে মার্কস বা এঙ্গেলস আলাদা কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে তাঁদের বিভিন্ন রচনাবলি ও চিঠি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা এ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানতাত্ত্বিক

বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্য বিষয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবনাপ্রসূত। এই মতের প্রবক্তাগনের মতে বাস্তব পৃথিবীই সবকিছু। তাঁরা আরও মনে করেন যে বাস্তব পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে বা ঘটে তা ঈশ্বর নির্দেশিত নয়; বরং বাস্তব প্রকৃতির অর্ন্তনিহিত নিয়মে ঘটে। তারা আরও মনে করেন যে, মানুষের মন বাস্তব সম্পর্কহীন স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নয়; বরং তা বাস্তবেরই সৃষ্টি। সর্বশেষ তাঁরা মনে করেন যে, পৃথিবী রহস্যময় কিন্তু এর সমস্ত রহস্যকে উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বশীর আল হেলাল বলেছেন–

> তিনি আমাদের ছোটগল্পে অন্তত এইদিক থেকে পথিকৃত যে, তিনিই প্রথম প্রকৃত শ্রমিক-জীবনের আলেখ্য উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শ্রেণীসংগ্রাম ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-চেতনা তার গল্পে মূর্ত হয়েছে। [হেলাল ১৯৯৫: ১০৭]

মার্ক্সবাদী দার্শনিকরা জগৎ ও জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কথা বলেছেন, সেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সাহিত্যের মধ্যেও রূপায়িত হতে দেখা যায়। মার্কস এবং এঙ্গেলস যৌথভাবে *দ্যা হলি ফ্যামিলি* (১৯৪৫) ও *দ্যা জার্মান আইডিওলজি* (১৯৪৬) গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা সামাজিক অবিচার ও বিশৃঙ্খলা, অসাম্য ও শোষণের মূল কারণের যৌক্তিক ব্যখ্যা প্রদান করেছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস সামাজিক অসাম্য ও শোষণের মূল কারণ যে মানুষের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে অবলম্বন করেই সৃষ্ট সেই বিষয়টিরই ব্যখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন ইতিহাস হলো সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও তার বস্তুকেন্দ্রিক পরিস্থিতির বিকশিত রূপ। স্থূলভাবে বলা যায়– মার্ক্সবাদের মূল কথা শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম এবং অবশ্যই তা শুধু তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়; প্রয়োগের মধ্যেই তার সার্থকতা। সমাজ-বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক নিয়মে ক্রমশ যখন ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন প্রথার সূত্রপাত তখন থেকেই শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব। তখন থেকেই সমাজ স্পষ্টত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত একদিকে বিপুল ক্ষমতা ও অর্থবিত্তের অধিকারি মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণি বিপরীতে অসংখ্য বিত্তহীন শোষিত শ্রেণি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় রাজনীতির লক্ষ্য। মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য প্রয়োজন সাম্যবাদী, শোষণহীন, শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থা।

> A classless society is a society in which no one is born into a social class like in a class society. Distinctions of wealth, income, education, culture, or social network might arise and would only be determined by individual experience and achievement in such a society. Thus, the concept posits not the absence of a social hierarchy but the uninheritability of class status. Helen Codere defines social class as a segment of the community, the members of which show a common social position in a hierarchical ranking. [Codere 1957: 473]

রাষ্ট্র বা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি হয় ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক তাহলে সমাজও হবে ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক। এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হয় শ্রেণি বৈষম্যমূলক, শাষক-শোষিতের সম্পর্ক। এরূপ সমাজে শোষিতরা সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকে কিন্তু উৎপাদনের সুফল থেকে শুধু বঞ্চিতই হয় না বরং উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত হয়, পরিণত হয় রক্ত-মাংসের যন্ত্রাংশে। শোষক শ্রেণি শ্রমিকদের শ্রমকে আত্মসাৎ করে গড়ে তোলে পুঁজির পাহাড়। অন্যদিকে মেহনতি জনগণ আরও বেশি দুর্দশায় পতিত হয়। ফলে এই দুই বিপরীত শ্রেণির মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে মালিক শ্রেণি মেহনতি শ্রেণির দৃষ্টিতে অত্যাচারি, দুষ্কৃতিকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরিণামে বিধ্বস্ত শোষিত শ্রেণির মধ্যে পুঞ্জিভূত হয় ক্ষোভ। একক ব্যক্তির পুঞ্জিভূত ক্ষোভ একদিন গোষ্ঠীর সম্মিলিত বঞ্চণার একক স্বরে পরিণত হয়। শোষিতরা নিজেদের প্রাপ্য হিস্যা বিপ্লব ও সংগ্রামের মাধ্যমে আদায়ে সংঘবদ্ধ হয় এবং শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভের দিকে অগ্রসর হয়।

মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব। এই তত্ত্বে ইতিহাস বস্তুবাদী ও দ্বন্দ্বমূলকভাবে বিবেচনা করা হয়। তাই মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি বস্তুবাদী এবং দ্বান্দ্বিক। সাহিত্যের সঙ্গে শ্রেণির সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের ধরন, সাহিত্যে বাস্তবের প্রতিফলন, সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ– এই সবকিছুই এই তত্ত্বের পরিধির অন্তর্গত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সমালোচনায় কী করে রচনাটি তৈরি হয়েছে এবং সেই রচনায় শোষিত বঞ্চিত শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে কি-না, তাও এই আলোচনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যে ধারা, তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– তা মূলত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। *চর্যাপদ*, *মনসামঙ্গল*, *মানসিংহ ভবানন্দ* প্রভৃতি সাহিত্যিক নিদর্শনে এই শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়।

আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম পর্বের ছোটগল্পে বিশেষত *জেগে আছি* (১৯৫০), *ধানকন্যা* (১৯৫১) ও *মৃগনাভি* (১৯৫৩) গ্রন্থের অন্তর্গত অধিকাংশ গল্পে উপরিউক্ত আলোচনার বিষয়গুলোর অনুবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য–

> ১৯৪৭-'৫৭ সময় প্রবাহে রচিত 'জেগে আছি' (১৯৫০), 'ধানকন্যা' (১৯৫১) এবং 'মৃগনাভি' (১৯৫৩) গ্রন্থে মূলত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক শ্রেণি-শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। সনাতন গ্রামজীবনের পটভূমিকায় শোষক ও শোষিতের আবহমান দ্বন্দ্ব এবং এই আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী-তৃণমূল মানুষের প্রতিবাদী চেতনা শিল্পিত রূপ লাভ করেছে । আলোচ্য পর্বে জীবন রূপায়ণে লেখকের সমাজ সচেতন, মানবতাবাদী শিল্পদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। [বোস ২০০৯: ৯৭]

'একটি সভ্যতা', 'কবি', 'অসমাপ্ত', 'ফেরার', 'শিকড়', 'চেহারা', 'শিষ ফোটার গান', 'মোচড়', 'জবানবন্দী', 'চারগুণ্ডা', 'ধোঁয়া', 'কয়লা কুড়ানো দল' গল্পগুলোতে শোষক ও শোষিতের বিপ্রতীপ সম্পর্কের বাস্তব প্রেক্ষাপটে লেখকের মানসযাত্রার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

***জেগে আছি* গল্পগ্রন্থে শ্রেণিচেতনার স্বরূপ:** ১৯৫০ সালে প্রকাশিত *জেগে আছি* গল্পগ্রন্থে সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো হলো 'কাঠের নকশা', 'শিকড়', 'মুখোমুখি', 'সৃষ্টি', 'অসমাপ্ত', 'মোচড়', 'একটি কথার জন্ম'। প্রতিটি গল্পে লেখকের রাজনীতি সচেতনতা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি একান্ত আস্থার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'মুখোমুখি' (১৯৪৮) গল্পটি মার্কর্সবাদী ভাবধারায় রচিত গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রতিনিধিত্ব স্থানীয়। গল্পকার এখানে ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন শৈল্পিক চেতনায়। তিনি সমকালকে বিবেচনায় রেখে মানুষের প্রয়োজন, স্বপ্ন এবং পরিকল্পনাকে গল্পে স্থান দিতে চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি মৌলিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত অবস্থা ও অবস্থান প্রভৃতিও লেখকের ভাবনাভুবনকে প্লাবিত করেছে। ব্যক্তি ও সমাজ যে পরস্পর নির্ভরশীল এবং সমাজের বিকাশ যে ব্যক্তির চিন্তা ও কল্পনাও ওপর নির্ভর করে, তা আলাউদ্দিন আল আজাদ জানতেন; এবং তাঁর সেই জানা কথাগুলো কল্পনাকে ভর করে গল্পের ক্যানভাসে জায়গা করে নিয়েছে। *জেগে আছি* সম্বন্ধে সমকালের সমালোচকদের কিছু অভিমত নিম্নরূপ:

> ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ তরুণ লেখক, জেগে আছি তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। ইতস্তত তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ এর আগে পড়েছি, চমক দিয়েছে। জেগে আছি সেই চমককে বিস্ময়ে পরিণত করেছে। বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে পারি, জেগে আছি সাম্প্রতিক মুসলিম সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ এবং সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা বই। [বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০]
>
> খ) ... আলাউদ্দিন আল আজাদের 'জেগে আছি' বইটির আলোচনা করতে গিয়ে পুরনো কথাগুলো মনে পড়ল। এখন বেশ সাহসের সঙ্গেই ভাবছি, কেউ যদি পাল্টে ফের এসে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে, তাহলে অন্তত এই একটি বইয়ের জোরেই আমাদের এ বাংলার সাহিত্যিক অগ্রগতির নিশানা তাকে দেখাতে পারব। [ইসলাম (১৯৫০]

শ্রেণিভিত্তিক সমাজে শোষণের নানামাত্রিক রূপ শোষিতদের অধিকার আদায়ে স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ ও তাদের একত্রিত হয়ে সামষ্টিক স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের মাধ্যমে মানবমুক্তির কথা স্পষ্টভাবে এই গল্পে বলা হয়েছে। জমিদারি প্রথার আমলে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বড় হাউরের বানিয়ারচং নামক এলাকায় ধান কাটতে যাওয়া কিছু শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে গল্পের সূত্রপাত। এই মানুষগুলো কয়েক মাসের অন্ন সংস্থানের আশায় পৌষের শীতে সূর্য ওঠার আগেই মাঠে ধান কাটতে নেমে পরে বিনিময়ে পায় দুই বেলার খোরাকি ও ধানের এক-তৃতীয়াংশ। আরও আছে

বর্গাচাষী যারা সারা বছর পরিশ্রম করে, রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায় কিন্তু ফসলের ভাগ পায় আধাআধি। অর্থাৎ শ্রমিকরা তাদের শ্রমের সুফল ভোগ করতে পারে না উপরন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পায় না । অন্যদিকে জোতদার শ্রমিকদের শ্রমকে কুক্ষিগত করে নিজেদের আরাম আয়েস নিশ্চিত করে। শ্রমিকদের ঘাম রক্তের বিনিময়ে ইহকালের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার পর পরকালের অসীম সুখেরও পাকা ব্যবস্থায় মনোযোগী হয়। শোষক শ্রেণির প্রতিভূ জোতদারকে তাই দেখা যায়–

> হজ করে এসেছেন এবার। সংসারের টানাপোড়েন থেকে বিদায় নিয়েছেন তাই। সারাদিন কোরান-কিতাব তেলাওয়াত করা, জায়নামাজের ওপর বসে চোখ বুঁজে থাকাই হল তাঁর একমাত্র কাজ। [আজাদ ২০০২: ৪৬]

আলোচ্য গল্পে হাওর অঞ্চলে মুনি খাটতে এসেছে যারা তাদের 'অধিকাংশের বয়েস সাতাশের এপার-ওপার' [আজাদ ২০০২: ৪৩] হলেও ষাটোর্ধ রহিম বখ্শও জীবন-জীবিকার তাগিদে ওদের সাথে শামিল হয়েছে। মজিদ, শুকুর, মধুসহ আরো অনেকে এসেছে পরিবার ছেড়ে, প্রিয় মানুষ ছেড়ে– পেটের জ্বালা নিবারণের আশায়। নিজেদের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বঞ্চিত জীবন নিয়ে তারা নিজেরাই করে নির্মম পরিহাস । গল্পে মধু নামক একটি চরিত্রের রসিকতায় তার প্রতিফলন দেখা যায়–

> পেটটা না থাকলেই চলত। এহানে আর আওন লাগত না। বৌয়ের গলায় মালা দিয়া সামনে নিয়া বইসা থাকতাম অষ্টপহর। গলা ছাইড়া দারুণ পীরিতির গান গাইতাম পরানের জ্বালায়।
>
> লও পেটটা কাইটা ফালাইয়া দেই। মজিদ আরেক দাগ উপরে উঠল, তা অইলে আর খাওনের লাইগা ভাবুন লাগব না। [আজাদ ২০০২: ৪৪]

পেটের তাগিদে তারা ঘর ছেড়েছে, জোতদার ধান কাটার বিনিময়ে দুই বেলা খেতে দেবে কিন্তু সেখানেও শোষকের নিষ্ঠুর স্বরূপ উন্মোচিত হয়। সমাজে যে উচ্চশ্রেণির দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণির লোকেরা সবসময় বঞ্চিত হয়ে আসছে, তারই সাহিত্যিক দলিল যেন গল্পকার আজাদ পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। কাহিনিকার এখানে ক্ষুধা-দায়গ্রস্ত মানুষের দুর্দশার ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন মমতার সাথে। এবং সম্ভবত অবেহেলিত মানুষের জন্য এক ধরনের সহানুভূতির পথ নির্মাণ করাও তাঁর সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে হতে পারে। প্রসঙ্গত, রহিম বখশের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়–

> চোখ কচলিয়ে হৈ হৈ করে উঠল রহিম বখশ, আজ বেশি খাইতে পারি নাই। যা খাওয়া দেয়। আধা খুদ আর আধা চাউলের জাউ। দেখলেই দিলডা ফিইরা যায়। মনে লয়, লাথি মাইরা ফালাইয়া দেই। [আজাদ ২০০২: ৪৪]

সুষম বন্টনের অভাবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাছে কুক্ষিগত হয় সম্পদ, খাদ্য-শস্যসহ জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু। অগনিত ক্ষুধার্ত মুখ, খাদ্যের অভাব, হাহাকার সর্বত্র। লেখকের বর্ণনায় গল্পে এই নির্মম সত্য ফুটে উঠেছে– 'আমরা ক্ষুধিত। আমরা খেতে চাই। আমরা খাব। সারা দেশটা গুমরে গুমরে চিৎকার করে।' [আজাদ ২০০২: ৪৫] লেখকের অভিজ্ঞতায় আছে ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, খাদ্য সংকটে ভারতের লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। লেখক যেহেতু শব্দ সৈনিক, তাই সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে শৈল্পিক বাস্তবতায় মূর্ত করেছেন। শত শত বছরের শোষণ প্রক্রিয়া জোতদার, জমিদার, পুঁজিপতিদের অবচেতনে শিকড় গেড়েছে, একে তারা বৈধ বলেই বিশ্বাস করতে পছন্দ করে। এই শোষণ প্রক্রিয়া জনসাধারনের পক্ষ থেকে বৈধতা লাভের জন্য তারা কৌশল অবলম্বন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই দিয়ে এই মূর্খ, অসহায় মানুষকে সহজেই বশে আনা হয়। আলোচ্য গল্পেও শোষক জোতদার তিন গম্বুজওয়ালা সুন্দর মসজিদ তৈরি করে, মহান ও ঈমানদার হিসেবে সমাজে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

শোষক শ্রেণি তাদের শোষণকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মধ্যবর্তী একটা শ্রেণিকে কৌশলে কাজে লাগায়। কিছু সুবিধার বিনিময়ে বিত্তহীন শ্রেণি থেকেই এই মধ্যবর্তী শ্রেণি তৈরি করা হয়। আলোচ্য গল্পে গোমস্তা ও লাঠিয়াল বাহিনীকে সেই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। গোমস্তা ও লাঠিয়াল বাহিনীকে জোতদার নিজ স্বার্থ রক্ষার কাজে লাগিয়ে নিজেরা থাকে নিরাপদ দূরত্বে। সাধারণ জনগণ যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তখন জনগণ ও উচ্চ শ্রেণির মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সুবিধাভোগী শ্রেণি। ফলে লড়াইটা বাধে বিত্তহীন অত্যাচারিত জনগণ ও সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী শ্রেণির মধ্যে। মূল শোষক শ্রেণি থেকে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এই গল্পে লক্ষণীয় দিক যে শোষিত শ্রেণি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। জোতদার যখন চুক্তি মোতাবেক ধান না দিয়ে সামান্য টাকা হাতে ধরিয়ে দিতে চাইল তখন তারা মেনে নিল না। তারা তাদের শ্রমকে কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হয় লাঠি, কাস্তে, সড়কি নিয়ে প্রস্তুত হয়। মিথ্যা শোষণ-বঞ্চনার ভিতকে উৎপাটনের জন্য আক্রমণ করে কিন্তু সতর্ক জোতদারের লাঠিয়াল বাহিনীরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। জোতদার জমিদাররা শত শত বছরে তৈরি করা শোষণের সৌধ সহজে পতন হতে দেবে না । তাই টাকার বিনিময়ে পুলিশকে এই ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সংগ্রামী মানুষের জয় সূচিত হয় লাঠিয়াল সর্দারের চেতনার জাগরণের মাধ্যমে, ব্যক্তি স্বার্থ সচেতন লাঠিয়াল সর্দার সামষ্টিক মানবতাবাদী স্বার্থ চেতনায় উন্নীত হয়। লাঠিয়াল সর্দারের মন্তব্য– 'এদ্‌দিন জুলুম কইরাছি নিজের উপর। নিজের উপরই লেলাইয়াছি নিজের তাকত। অহন ত লাগাইব নিজেরে বাঁচাইবার লাইগা। এর চাইতে আনন্দ কই আছে ?' [আজাদ ২০০২: ৫৩]

শ্রেণি শত্রুমুক্ত, শোষণহীন সমাজ গড়ার জন্য সংগ্রাম বিপ্লবের প্রয়োজন। যতক্ষণ সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার নির্মূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয় সূচিত হবে না। ক্ষমতাশালীরা বারবার আঘাত হানবে সেই আঘাতকে প্রত্যাঘাত রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আন্যায় মানসিকতার মূলে আঘাত করে তার বিনাশ করতে হবে। তাই গল্পের শেষে যখন পুলিশের সহায়তায় আন্দোলনকে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্র করা হল তখন পুলিশকে বাধা দিতে সর্বাগ্রে ষাটোর্ধ্ব রহিম বখ্‌শ দৌড়ে গেল। ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথ অনেক দীর্ঘ। সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণ প্রজন্মকে দায়িত্ব নিতে হবে। তাই রহিম বক্‌শ তরুণদের প্রস্তুত হয়ে ভবিষ্যতে লড়বার জন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তার উক্তি 'আমি বুড়া মানুষ, মরলেও কোন ক্ষতি নাই। আমিই সামনে দাঁড়াই।' [আজাদ ২০০২: ৫৩]

২

'অসমাপ্ত' (১৯৪৮) গল্পটিতেও 'মুখোমুখি' গল্পের মতোই মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু উপরওয়ালাদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকতে দেখা যায়। যারা শ্রমের সাথে সরাসরি জড়িত ও অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে তারাই জিম্মি হয়ে থাকে অত্যচারী ক্ষমতাবানদের কাছে। তাই অন্যায়ের প্রতিবাদে একজোট হয়ে রেলওয়ে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নামে। তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সচেতন ছাত্র সমাজ। তখনই শোষক সংখ্যালঘুরা পুলিশের সহায়তায় দমন পীড়ণ শুরু করে। কিন্তু জনগণ অতীতের মতো অসচেতন নয়। তারা অত্যাচারিদের মনস্তত্ত্ব বুঝে গিয়েছে। তাই তারা সতর্ক। ক্ষমতাবানদের চরিত্র ও কৌশল উন্মোচিত হয়েছে গল্পে সতর্ক জনগণের প্রতিনিধি হারুনের মন্তব্যে–

> ওদের একটা বড়ো পলিসি হল আমাদের মধ্যে যারা মাথা তাদের গ্রেপ্তার করে সবকিছু বানচাল করে দেওয়া। ... ওদের আরেকটা নীতি হল, টাকায় দালাল ঠিক করে ভেতর থেকে সংগঠনে ভাঙন আনা। [আজাদ ২০০১: ১৪]

গল্পের শেষে হারুনের মৃত্যুর পর তার মায়ের যে ইতিবাচক মানসিক বিবর্তন সেখানেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় লেখকের আদর্শিক দায়বদ্ধতার অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে। হারুনের মা ছেলেকে আর বিপ্লব ও আন্দোলন থেকে বিযুক্ত রাখতে চান না। হারুনকে দেখতে আসা মজুর, বস্তির ঘুটেকুড়ানি, ঝাড়ুদার, কটামুখ রিকশাওয়ালা, গলায় রুপোর পাটা ঝুলানো বেড়ালমুখো গাড়োয়ান, মুচি আর মেথরদের সাথে হারুণের আত্মিক যোগের সূত্রটি তার মায়ের কাছে স্পষ্ট হয়। এদের দাবি আদায়ের আন্দোলনে হারুণের মায়ের একাত্মতা এভাবে প্রকাশিত হয়েছে–

> তোর জন্য ওরা এসেছে। ওঠ, চোখ খোল। এই পানি এনেছি, উঠে মুখ ধোও। দুধটা গরম করে আনি, চুমুক দিয়ে খেয়ে ওদের সঙ্গে যাও। আর তোমায় বাধা দেব না। ওদের সঙ্গে যাও, ওরা তোমায় ভালোবাসে–' [আজাদ ২০০১: ১৭]

৩

'কাঠের নকশা' (১৯৪৭) গল্পটি পরবর্তী সময়ে লেখক 'একটি সভ্যতা' নামকরণ করেন। এই গল্পে শ্রেণিদ্বন্দ্বের সমান্তরালে শোষিত শ্রেণির মধ্যে লুকায়িত স্বার্থান্বেষী শ্রেণিশত্রুর নোংরা চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। জুগালি রহমান ওরফে রহমান ওস্তাগারের মতো হীন দুর্বৃত্ত চরিত্রের বিপরীতে গল্প কথকের বাবা রাজমিস্ত্রির সর্দারের মতো নিঃস্বার্থ, শিল্পমনা ব্যক্তিরা শ্রেণি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। পারিশ্রমিকের ন্যায্য দাবিতে মিছিল করে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী, শ্রেণিশত্রু বিশ্বাসঘাতকরা শোষক শ্রেণির প্রত্যক্ষ মদদে আন্দোলনকে নস্যাৎ করার পরিকল্পনা করে। কখনো কখনো তারা সফল হলেও চূড়ান্ত সফল কখনও হয় না, হতে পারে না। তার উদাহরণ দেখা যায়–

> কিছুদিন থেকেই মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন চলছে। সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে রহমান ওস্তাগার। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার গোপন যোগসাজসের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। মিস্ত্রিরা চোখ রাঙাল, ঠাটানি দিল। [আজাদ ১৯৭৪: ১৬]

গল্পে বিশ্বাসঘাতক রহমান ওস্তাগার অনৈতিকভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভের পরে সর্দারের শিল্প-সংস্কৃতিও লুট করে নিতে চায়। এখানে শোষক শ্রেণির লুণ্ঠন মানসিকতার বহুমাত্রিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে নির্যাতিত জনগনের সতর্ক প্রহরায় সেই ষড়যন্ত্র সফল হয় না। গল্পে সচেতন জনগনের প্রতীক রাজমিস্ত্রির সর্দারের স্ত্রী। অন্য গল্পগুলোর মতো এই গল্পেও নিরাশার পরিবর্তে সর্বহারা, নির্যাতিত মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় ও অটল মানসিক শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়।

৪

'একটি কথার জন্ম' (১৯৪৯) গল্পটিতে গল্প কথক ফেরিওয়ালার জবানীতে রেলস্টেশনকেন্দ্রিক জীবনের নির্মম বাস্তবতা মূর্ত হয়েছে। নিঃস্ব, আশ্রয়হীন, অন্নাভাবে জর্জরিত কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের সহায়ক শক্তি ফেরিওয়ালা ও চা বিক্রেতা কালু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চরিত্র চা বিক্রেতা কালু। ঢাকা রেলস্টেশনের পাশে কালুর চায়ের দোকানকে ঘিরে দেখা যায় সর্বহারা মানুষদের আড্ডা। রেলস্টেশন বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ চা বিক্রেতা কালু । কালুর দোকানে আসে রিক্সাওয়ালা, শ্রমিক আন্দোলনে আহত গাড়িওয়ালা, '৪৬ এর দাঙ্গায় পরিবার হারানো বুড়ো বিহারী, প্রফেসরের মতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা। গল্পে আরও আছে সমাজের সুবিধাবাদী মধ্যস্বত্বভোগী ও শ্রেণিশত্রুর প্রতিভূ সর্দার, স্টেশন মাস্টার, কন্ট্রাক্টর। যারা পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থার সুযোগে অসহায় নারীর সম্ভ্রমকেও পণ্যে পরিণত করতে কুণ্ঠিত হয়না। এই গল্পে উমরের বৌ সেই অসহায় মানবরূপী পণ্য। পুঁজিবাদিদের সহায়ক ও সমাজের শ্রেণিশত্রুরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এই মানব পণ্যকে তুলে দেয় ভোগবাদী শোষক কন্ট্রাক্টদেরর হাতে। অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে এই পণ্যকরণ প্রক্রিয়ার পিছনে সক্রিয় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় উমরের বৌয়ের বক্তব্যে–

> আমার কোন দোষ নাই। টেহার লালচ দেহাইয়া আনছে, আমারে কাপড় দিছে । খাওন দিছে। আমার দোষ নাই, না খাইয়া আমার দুধের বাচ্চা মইরাছে, সোয়ামি মইরাছে। দেশ ছাইড়া আইছি। বাড়ি নাই, ঘর নাই। [আজাদ ১৯৭৪: ১৬৪]

অন্যায়, শোষণের বিচিত্র রূপ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে যা মূলত *জেগে আছি* গল্পগ্রন্থের অন্যন্য গল্পকেও একই সূত্রে অন্বিত করেছে। সর্দার, স্টেশন মাস্টার, কন্ট্রাক্টর সবাই দেশ ও জনগণের শত্রু। তারা চোরাকারবার ও বেআইনি কাজের সঙ্গেই শুধু যুক্ত নয়, রহমান ওস্তাগারের মতো এরা শোষিত সর্বহারাদের ন্যায্য আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য গোপনে সরকারের কাছে পাচার করে ব্যক্তিস্বার্থের বিনিময়ে। গল্পে সর্দার সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন–

> ওপর সংগে যোগাযোগও রয়েছে ভালো। নইলে বড় রাস্তার ওপর একতালা বাড়িও উঠত না, মিহিন পীরহান আর জিন্নাহ ক্যাপও জুটত না। গুপ্তচর বিভাগকে নিত্য নতুন সংবাদ সরবরাহ করেই তো এমন। [আজাদ ১৯৭৪: ১৬৪]

কিন্তু সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করার নেতৃত্ব নিজ কাধেঁ তুলে নেয় চা বিক্রেতা কালু। গল্প কথককে সঙ্গে নিয়ে ছুরি হাতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ছুটে যায়, সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগায়। গল্পের শেষে সুবিধাবাদী সর্দারের জিঘাংসার কারনে তাকে আশ্রয়হীন হতে দেখা যায়। তবে তার মনোবল ও বিশ্বাসকে দুর্বল করা যায় না কারণ কালু, হারুণ, রহিম বক্শ শক্তির মূলে রয়েছে লক্ষ কোটি সর্বহারার অপমান-লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সুদীর্ঘ ইতিহাস। তাই সর্দারের ঘর ছাড়ার নির্দেশের উত্তরে দ্বিধাহীন প্রত্যয়ে কালুর উচ্চারণ 'ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েই মনে করোনা আপদ চুকে গেল। যেখান থেকেই তাড়াও না কেন, জেনে রাখ জায়গা আমাদের ফুরাবে না।' [আজাদ ১৯৭৪: ১৬৭] লেখকের মানবতার পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব কালুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কৃষকরা সারা বছর পরিশ্রম করে ফসলের ন্যায্য ভাগ পায় না, কালোবাজারির দৌরাত্ম্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চ মূল্যে সাধারণের নাগালের বাইরে, ১৯৪৩ এর মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত মানুষ কিন্তু এক শ্রেণির সুদিন আসে মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই। দরিদ্রদের অসহায়ত্বের সুযোগে তাদের ভিটে ছাড়া করার কৌশল এবং তারই বিপরীতে বাপদাদার ভিটে ও দেশকে আকড়ে থেকে অস্তিত্বের শিকড়কে দৃঢ়তা দান এসবই 'শিকড়' (১৯৪৮) গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন।

> বাংলার ইতিহাসে চল্লিশের দশক ছিল বিপর্যয়কাল। অধিকাংশের বিশ্বাস এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় গণজাগরণ। আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম গ্রন্থ 'জেগে আছি' (১৯৫০)র গল্পগুলোতে এরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। [রহমান ২০১৫: ৫৩]

কৃষকদের ঠকানোর চিরায়ত কৌশল লেখকের বর্ণনায় 'কাজে কড়াক্রান্তির শৈথিল্য ঘটলে বড়োমিয়া মজুরি নিয়ে ঘুরাবেন একমাস অথবা দিলেও দেবেন অর্ধেক কিংবা বারো আনার জায়গায় পাঁচ আনা।' [আজাদ ১৯৭৪: ১৩৯] শ্রমজীবীদের ঠকানোকে জোতদার ও জমিদাররা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রথা বলেই মনে করে। ধর্ম, স্থান, কাল ভেদে এই চিত্রের কোন ব্যত্যয় ঘটে না 'আরে হিন্দুই কও আর মুসলমানই কও গরীবের সবখানে একই হাল ।' [আজাদ ১৯৭৪: ১৪৯] তাদের ধর্ম নাই, বর্ণ নাই পৃথিবীর সবস্থানে তাদের একটাই পরিচয় গরীব। আলোচ্য গল্পে শুরু থেকেই এই অঞ্চলের মানুষদের অসাম্প্রদায়িক চেতনাটি প্রকাশিত হয়েছে। গরীবদের আরো গরীবে পরিণত করে বড়ো মিয়া, মোগল ব্যাপারিরা সমাজের গভীরে তাদের লোভের শিকড় প্রোথিত করে। নিতাই, হাফিজ, হামিদদের ছিন্নমূল বানিয়ে উচ্ছেদ করে নিজেদের বিত্ত-বৈভকে সম্প্রসারিত করে। কিন্ত বিত্তশালীদের অগোচরেই সর্বহারা মানুষদের মাঝে চেতনার উন্মেষ ঘটে, সকল নিপীড়িত জনগণ একত্রিত হয়ে নতুন ভোর আনার সংকল্প গ্রহণ করে। সেই সংকল্প হাফিজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এভাবে–

> এইডা না মাইনা পারো না, আমরা জোট বানলে থাকতে পারি। আমরা যদি বলি কাজ নাই, কাজ দিতে অইব। না দিলে গুদাম লুট করব। দেখ গিয়া কত চাল গুদামে আছে। কত বস্তার পর বস্তা। জোর কইরা আনলে কোন দোষ নাই। খাইয়া বাঁচন লাগব তো ?... কাস্তে ধরা হাতের রগগুলো ফুলে উঠে।[আজাদ ১৯৭৪: ১৪৮]

এভাবেই সর্বহারা বঞ্চিতরা একদিন আত্মসচেতন ও প্রতিবাদী সংঘবদ্ধ জোটে রূপান্তরিত হয়। তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধে শোষকদের দুর্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই প্রত্যাশায় নতুন দিনের ভোরের অপেক্ষা করে।

> মনে রাখা দরকার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার প্রভৃতি সম্ভব না হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনার জাগরণ ঘটবে না। রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে হয়তো কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা নইলে সামাজিক বিপ্লব সার্থক হয় না তা অনেকটা সময়সাপেক্ষ।[মুখোপাধ্যায় ২০০৬: ৪৮]

শিক্ষার প্রসার ছাড়া স্বাধীন চিন্তার সক্ষমতা, আত্মসচেতনা সর্বোপরি মানসিক মুক্তি অসম্ভব। তাই অনেক গল্পে শিক্ষা বিষয়ে নানা মাত্রিক অলোকপাত লক্ষ করা যায়। লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদের 'সৃষ্টি' (১৯৪৮) গল্পে শিক্ষা সমস্যা, শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা, ছাত্র ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শিক্ষকদের উদ্বেগ, সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তার রোধে শ্রেণিশত্রুদের ষড়যন্ত্র সবকিছুই সাবলীলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পেও শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করতে এক জোট হয় বঞ্চিত শিক্ষক সম্প্রদায়। সমগ্র শিক্ষক শ্রেণির উপলব্ধি পণ্ডিত মাহমুদের বয়ানে এভাবে উঠে এসেছে 'দেশটারে ছারখার করে ফেলছে স্বার্থান্বেষীর দল।' [আজাদ ১৯৭৪: ৪৫] পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে সংখ্যালঘু স্বেচ্ছাচারি বুর্জোয়াদের হাতে। তাদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানো। কারণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় থাকলে রাষ্ট্রযন্ত্র শোষণের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে সংখ্যালঘু বুর্জোয়া শ্রেণির অবাধ মুনাফা লাভের পরিধিকে সহজ ও বিস্তৃত করে। সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি যুক্ত অথচ মালিক নয় এবং মালিক পক্ষ– এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব যা অনিবার্য পরিণতি শ্রেণি-সংগ্রাম। শ্রেণিহীন, শোষণহীন আদর্শ সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণিকে সুসংহত ও সংগঠিত করাই মার্কসবাদের আদর্শিক অবস্থান। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে শোষিতদের রুখে দাঁড়ানোর মাধ্যমে নিজের অধিকার আদায়ের যে প্রত্যয় গল্পটিতে ব্যক্ত হয়েছে, তা মার্কসবাদের মূল বাণী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রগামী হয়ে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই মার্কসীয় রাজনীতির অভীষ্ট। এরপর জনমুখী সামাজিক অগ্রগতির পথ ধরে সমাজতান্ত্রিক স্তর অতিক্রম করে সাম্যবাদী, শ্রেণিহীন, শোষণহীন, উন্নয়ন অনুকূল সমাজব্যববস্থা কায়েম হলে মানুষের জীবন-যাপন ও জীবন-দর্শনের সর্বতো উন্নতি ঘটবে এবং মানবতার মুক্তি ঘটবে। এই শ্রেণি-সংগ্রামের পথ ধরে 'Thesis', 'Antithesis' এবং 'Synthesis' এর চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে শ্রেণি-বৈষম্যহীন সর্বহারাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া মার্কসীয় সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। 'আজাদের সময় থেকেই আমাদের গল্পের অঙ্গনে নতুন যাত্রাপথের দ্বার উন্মুক্ত হোল, এ পথ সনাতন বিরোধী, আধুনিক অথচ সাধারণ জনজীবন সংলগ্ন'। [হানুম ১৯৯৭: ২১৮]

লেখক স্বয়ং তাঁর *জেগে আছি* সম্পর্কে বলেছেন–

> ছোটবেলা থেকেই আমার জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য। সতোরো বছর বয়সে প্রকাশিত আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি'র গল্পগুলোতে যে শ্রেণীযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি তারও একই কারণ আমার সাহিত্য, আমার অভিজ্ঞতা ও আত্মচরিত। [আজাদ ২০০০: ১০]

উপসংহার: আলাউদ্দিন আল আজাদ গভীর সহানুভূতি নিয়ে কৃষক, শ্রমিক, কুলি, মজুর, খেটে-খাওয়া মানুষের প্রথাগত সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন এবং সমস্যা-উত্তরণে নিজের সত্তায় ধারণ করা বিশ্বাসকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন। সর্বহারা ও বঞ্চিত জনগণের প্রতি তাঁর গভীর মমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি *জেগে আছি* গ্রন্থের গল্পগুলোতে শ্রমজীবী মানুষদের চরিত্র ও ঘটনা উপস্থাপনে অত্যন্ত আন্তরিক হলেও বক্তব্য উপস্থাপনে, ভাষা-প্রয়োগে অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং স্পষ্টভাষী। এই গল্পগুলোতে তাঁর শ্রেণি-বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

বশীর আল হেলাল (১৯৯৫), 'বাংলাদেশের ছোটগল্প', *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৬৩-১৯৭৬), সংকলক ও সম্পাদক: মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Codere, H. (1957), `Kwakiutl Society: Rank without Class', American Anthopology, 59(3), JSTOR 665913

চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯), *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সত্যযুগ*, ১৯৫০, ১২ জুন, রবিবার, কলকাতা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯৫০), *মুক্তি*, সাহিত্যপত্র, মাসিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৭৪), *জেগে আছি*, মুক্তধারা, ঢাকা

----- (২০০০), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দ্বিতীয় সংস্করণ, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা

----- (২০০১), *শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প*, গতিধারা, ঢাকা

----- (২০০২), *স্বনির্বাচিত গল্প*, গতিধারা, ঢাকা

তবিবুর রহমান (২০১৫), আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প: বিষয় ও প্রকরণ, গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশন, ঢাকা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৬), *মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

খালেদা হানুম (১৯৯৭), *বাংলাদেশের ছোটগল্প* (১৯৪৭-১৯৭০), অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম